ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1865-1872
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.410

আলুচাষে কীটনাশক-নির্ভরতা, জৈব কৃষির সম্ভাবনা, সরকারি নীতি ও স্বাস্থ্য-সংকট: হুগলি জেলার প্রেক্ষিত

ড. মৌ সাউ, *রাজ্য সাহায্য প্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, ভূগোল বিভাগ, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Potato cultivation occupies a pivotal place in the agrarian economy of Hooghly district, West Bengal. It is not only a food crop but also a major cash crop that shapes rural income, labour demand, storage, transport, and local trade. Yet the expansion of potato farming has increasingly been accompanied by intensive use of chemical pesticides and fertilisers, especially to control blight and other crop diseases. This article examines the growing dependence on pesticides in potato cultivation, its implications for farmers' health, soil quality, water resources, and rural ecology, and the importance of connecting this debate with organic and sustainable alternatives. Drawing on findings from Hooghly district, the paper shows that frequent pesticide application, inadequate protective gear, weak access to scientific guidance, and market uncertainty have together deepened both production risk and health vulnerability. At the same time, bio-pesticides, crop rotation, healthy seed, organic composting, and farmer awareness are gradually opening a path toward safer cultivation. The article argues that sustainable potato farming requires an integrated policy framework involving farmer training, fair marketing, regulated storage, crop insurance, cooperative institutions, and support for value-added processing. The future of potato cultivation in West Bengal depends on balancing productivity, ecological resilience, farmer welfare, and public health.

Keywords: Potato Cultivation, Pesticides, Organic Farming, Health Risks, Government Policy, Hooghly District, Sustainable Agriculture

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-অর্থনীতিতে আলু বহুদিন ধরেই একটি গুরুত্বপূর্ণ ফসল, কিন্তু হুগলি জেলার প্রেক্ষিতে এর তাৎপর্য আরও গভীর। এখানে আলু কেবল পারিবারিক ভোগের জন্য উৎপাদিত শস্য নয়; এটি নগদ আয়ের প্রধান উৎস, বিপুল শ্রমসংস্থানের ক্ষেত্র, ঠান্ডা ঘর-নির্ভর বিপণনব্যবস্থার ভিত্তি এবং গ্রামীণ সামাজিক-অর্থনৈতিক জীবনের এক অনিবার্য অংশ। গবেষণায় দেখা গেছে, বিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকে বিশেষ করে আশির দশক পরবর্তী সময়ে হুগলিতে আলুচাষ এমনভাবে বিস্তার লাভ করে যে বহু ক্ষেত্রে তা ধান ও পাটকেও পিছনে ফেলে প্রধান নগদ ফসলের মর্যাদা পায়।[১] অনুকূল জলবায়ু, তুলনামূলক কম সময়ে ফসল

ওঠা, বিস্তৃত বাজার, ঠান্ডা ঘর ও রাস্তা-ঘাটের উন্নতি—সব মিলিয়ে আলু এই জেলার কৃষিজ অর্থনীতিকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।[২]

তবে এই সাফল্যের আড়ালে একটি অস্বস্তিকর বাস্তবতাও ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। আলুচাষ যত বেশি বাজারমুখী হয়েছে, ততই তা রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে। বেশি ফলনের চাপ, ব্লাইট ও লেট ব্লাইটের মতো রোগের ভয়, তাড়াহুড়ো করে বাজারে বিক্রি করতে না পারলে ক্ষতির আশঙ্কা, এবং কৃষকের সীমিত বৈজ্ঞানিক পরামর্শ— এই সব কারণ মিলিয়ে কীটনাশক যেন আলুচাষের এক প্রায়-অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এ নির্ভরতার অর্থ শুধু উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে মাটির ক্লান্তি, জলের দূষণ, কৃষিশ্রমিকের স্বাস্থ্যঝুঁকি, খাদ্যনিরাপত্তা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত সংকট।[৩]

এই প্রবন্ধে তাই আলুচাষকে কেবল উৎপাদন বা বাজারের প্রশ্ন হিসেবে নয়, বরং একটি সমন্বিত ভূগোল-সামাজিক সমস্যা হিসেবে দেখা হয়েছে। কীটনাশক-নির্ভর আলুচাষের বর্তমান চরিত্র, জৈব ও সমন্বিত বিকল্প পদ্ধতির সম্ভাবনা, সরকারি নীতির ভূমিকা, বাজারের অসাম্য, এবং মানবস্বাস্থ্যের ঝুঁকি—এই কয়েকটি স্তরকে একসঙ্গে বিবেচনা করেই এই প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে। আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে হুগলি জেলার অভিজ্ঞতা, তবে তার মধ্য দিয়ে বৃহত্তর পশ্চিমবঙ্গের কৃষি-বাস্তবতাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হুগলি জেলায় আলুচাষের বিস্তার ও অর্থনৈতিক তাৎপর্য: আলুর গুরুত্ব বোঝার জন্য প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে এটি একটি "দ্বৈত চরিত্রের" ফসল। একদিকে এটি সাধারণ মানুষের খাদ্যতালিকার অপরিহার্য অংশ; অন্যদিকে এটি কৃষকের কাছে লাভজনক নগদ ফসল। হুগলির কৃষকেরা দীর্ঘদিন ধরে এমন ফসলের সন্ধানে ছিলেন যা স্বল্প সময়ে তুলনামূলক বেশি আয় দেবে, বাজারে দ্রুত বিক্রিযোগ্য হবে এবং অন্য ফসলের ক্ষতি পুষিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখবে। এই কারণেই আলু দ্রুত জনপ্রিয় হয়। গবেষণায় উল্লেখ আছে, হুগলির অনেক এলাকায় আলু এমন এক ক্ষতিপূরণকারী ফসলে পরিণত হয় যা অন্য ফসলে লোকসান হলে কৃষককে আবার ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ দেয়।[৪]

কিন্তু এই লাভের সঙ্গে ঝুঁকিও সমানতালে বেড়েছে। আলু একটি ব্যয়বহুল ফসল; বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ, শ্রম, পরিবহণ, বস্তা, ঠান্ডা ঘর—সব মিলিয়ে এর উৎপাদনব্যয় ছোট ও প্রান্তিক কৃষকের জন্য খুবই চাপের। ফলে অনেক কৃষক ঋণ নেন, স্থানীয় মহাজন বা মধ্যস্বত্বভোগীর উপর নির্ভর করেন, এবং ফসল ওঠার পর তাৎক্ষণিক নগদের চাপে কম দামে আলু বিক্রি করে দেন। এর ফলে বাজারে যে লাভের চক্র তৈরি হয়, তার প্রধান অংশ কৃষকের হাতে না গিয়ে যায় আড়তদার, ফড়িয়া, ঠান্ডা ঘর-মালিক ও পাইকারদের হাতে।[৫]

এই পরিস্থিতি কৃষককে একটি কঠিন সিদ্ধান্তের সামনে দাঁড় করায়—তিনি জানেন খরচ বাড়ছে, তবু ফলন কমানোর ঝুঁকি নিতে পারেন না। বরং বেশি ফলন তুলতে এবং রোগ-পোকার আক্রমণ ঠেকাতে তিনি আরও বেশি রাসায়নিক উপকরণ ব্যবহার করতে বাধ্য হন। ফলে আলুচাষ একদিকে আয়ের প্রতিশ্রুতি দিলেও অন্যদিকে তা কৃষককে এক অনিশ্চিত, ঋণনির্ভর ও পরিবেশ-সংকটময় কৃষি ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দেয়। এই অর্থনৈতিক কাঠামো না বুঝলে আলুচাষে কীটনাশকের প্রশ্নটিও সঠিকভাবে বোঝা যায় না।

কীটনাশক-নির্ভর আলুচাষের বর্তমান চিত্র: হুগলি জেলার আলুচাষে কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ে করা সমীক্ষা একটি উদ্বেগজনক চিত্র তুলে ধরে। ২০২১ সালের মে-জুন মাসে জেলার চারটি উপবিভাগে ২০০ জন

আলুচাষির উপর পরিচালিত সমীক্ষায় দেখা যায়, প্রায় সব কৃষকই ছত্রাকনাশক ব্যবহার করেন; কারণ ব্লাইট ও লেট ব্লাইট রোগকে তাঁরা সবচেয়ে বড় বিপদজনক বলে মনে করেন। পাশাপাশি কীটনাশক, আগাছানাশক ও ব্যাকটেরিয়ানাশকেরও ব্যবহার রয়েছে, যদিও ছত্রাকনাশকের ব্যবহারই সবচেয়ে বেশি।[৬] অনেক ক্ষেত্রেই রোগের বাস্তব উপস্থিতির চেয়ে রোগের আশঙ্কাই ওষুধ ব্যবহারের বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

সমীক্ষায় আরও দেখা যায়, আলুচাষিরা বিভিন্ন বাণিজ্যিক নামের ওষুধ ব্যবহার করেন—যেমন কপার অক্সিক্লোরাইড, ম্যানকোজেব, ক্লোরপাইরিফস, ইমিডাক্লোপ্রিড, ফিপ্রোনিল ইত্যাদি। এগুলির অনেকই অপেক্ষাকৃত তীব্র রাসায়নিক প্রকৃতির। কিছু কিছু ক্ষেত্রে একই মৌসুমে তিন থেকে চার বার, আবার কিছু এলাকায় ছয় বার পর্যন্ত ছত্রাকনাশক প্রয়োগের ঘটনা দেখা গেছে। গবেষণায় এমনও উল্লেখ আছে যে, অনেক সময় প্রকৃত সংক্রমণ না ঘটলেও "হয়ে যেতে পারে" এই আশঙ্কায় কৃষক ওষুধ ছিটিয়ে দেন।[৭] অর্থাৎ আলুচাষে কীটনাশকের ব্যবহার অনেকাংশে প্রতিরোধমূলক নয়, বরং ভয়নির্ভর।

এই ব্যবহারের পেছনে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ঘাটতিও বড় কারণ। সমীক্ষায় পাওয়া যায়, কৃষকেরা মূলত দোকানদার, প্রতিবেশী কৃষক এবং নিজের অভিজ্ঞতার উপর ভরসা করেন। কৃষি আধিকারিককে নিয়মিত তথ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন অত্যন্ত অল্পসংখ্যক মানুষ। আবার লেবেল পড়ে সঠিক ডোজ বোঝেন এমন কৃষকের সংখ্যাও খুব কম; সঠিক মাত্রা জানলেও বাস্তবে তা প্রয়োগ করেন আরও কম।[৮] এই তথ্যটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এর মধ্যে কৃষি সম্প্রসারণব্যবস্থার দুর্বলতা, বৈজ্ঞানিক পরামর্শের অপ্রতুলতা এবং গ্রামীণ জ্ঞান-অবকাঠামোর সীমাবদ্ধতা একসঙ্গে ধরা পড়ে।

কৃষকেরা নিজেরাও লক্ষ করেছেন যে আগের বহু ওষুধ এখন আর আগের মতো কার্যকর নয়। ফলে একই রোগ দমনে বেশি মাত্রার ওষুধ বা নতুন প্রজন্মের ওষুধ ব্যবহার করতে হচ্ছে। সমীক্ষায় একটি উল্লেখযোগ্য অংশ জানিয়েছেন যে গত দশ বছরে তাঁরা ওষুধের মাত্রা বাড়িয়েছেন।[৯] এর ফলে একটি দুষ্টচক্র তৈরি হয়েছে—ওষুধের ডোজ বাড়ে, খরচ বাড়ে, প্রতিরোধক্ষমতা আরও জোরদার হয়, আবার নতুন ওষুধের প্রয়োজন পড়ে। কৃষক মনে করেন তিনি ফসল বাঁচাচ্ছেন; বাস্তবে তিনি আরও বেশি ব্যয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন এবং পরিবেশে আরও বেশি রাসায়নিক সঞ্চিত করছেন।

স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও মাটির উপর প্রভাব: আলুচাষে কীটনাশকের প্রশ্নটি কেবল কৃষি-প্রযুক্তির নয়; এটি জনস্বাস্থ্যেরও প্রশ্ন। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে, খুব অল্পসংখ্যক কৃষক দস্তানা ব্যবহার করেন, আরও কমসংখ্যক সুরক্ষিত জুতো পরেন; মুখ ঢাকার জন্য কাপড় বা সাদামাটা মুখোশ ব্যবহার করলেও তা পর্যাপ্ত নয়। বহু ক্ষেত্রেই কৃষকেরা খালি হাতে রাসায়নিক মেশান, স্প্রে-মেশিন পরিষ্কার করেন বা ওষুধের ডোজ নির্ধারণ করেন।[১০] ফলে বিষাক্ত রাসায়নিক কেবল ত্বকে নয়, শ্বাস-প্রশ্বাস ও চোখের মাধ্যমেও শরীরে প্রবেশ করে।

এর তাৎক্ষণিক ফল হতে পারে মাথা ঘোরা, চোখ জ্বালা, ত্বকে জ্বালা, শ্বাসকষ্ট, দুর্বলতা বা বমি বমি ভাব। কিন্তু দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি আরও উদ্বেগজনক। বারবার অল্পমাত্রায় বিষাক্ত পদার্থ শরীরে ঢুকলে স্নায়ু, লিভার, শ্বাসযন্ত্র, ত্বক এবং প্রজননস্বাস্থ্যের উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। ক্ষেত্রপর্যায়ের গবেষণায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে কৃষক-পরিবার, কৃষিশ্রমিক এবং গ্রামীণ পরিবেশ—সকলেই এই ঝুঁকির মধ্যে পড়ে।[১১] শুধু ক্ষেতের শ্রমিক নন, বাড়িতে রাখা কীটনাশকের বোতল, ব্যবহৃত প্যাকেট, দূষিত জামাকাপড় বা স্প্রে-যন্ত্রের মাধ্যমে শিশুরাও পরোক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

পরিবেশগত প্রভাবও সমান গুরুতর। বৃষ্টির জল, সেচের অতিরিক্ত জল অথবা জমির ঢাল বেয়ে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার নিকটবর্তী পুকুর, খাল কিংবা ভূগর্ভস্থ জলের অঞ্চলে পৌঁছে যেতে পারে। গবেষণায় স্পষ্ট বলা হয়েছে যে এই রাসায়নিক মিশ্রিত পানীয় জল, গবাদিপশু, পোকামাকড়, উদ্ভিদ ও সামগ্রিক জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি তৈরি করে।[১২] জলদূষণের প্রভাব অনেক সময় তাৎক্ষণিকভাবে চোখে পড়ে না, কিন্তু দীর্ঘদিনে তা গ্রামীণ স্বাস্থ্যের উপর গভীর ছাপ ফেলে।

মাটির অবস্থাও একইভাবে আক্রান্ত হয়। দীর্ঘকাল একমুখী রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারে মাটির জৈব উপাদান কমে যায়, অণুজীবের স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা বাধাগ্রস্ত হয়, এবং মাটি ধীরে ধীরে তার প্রাকৃতিক ভারসাম্য হারায়। গবেষণায় আলুচাষের সঙ্গে মাটির উর্বরতা হ্রাস, পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হওয়া এবং জমির 'উৎপাদন ক্ষমতা'-র সম্পর্কের কথা স্পষ্টভাবে উত্থাপিত হয়েছে।[১৩] অর্থাৎ আজ যে ফসলকে বাঁচাতে অতিরিক্ত ওষুধ প্রয়োগ করা হচ্ছে, দীর্ঘমেয়াদে সেই প্রক্রিয়াই কৃষিভিত্তির স্থায়িত্বকে দুর্বল করছে।

এই প্রেক্ষাপটে স্বাস্থ্য ও পরিবেশের প্রশ্নকে আলাদা করে দেখলে চলবে না। কৃষকের শরীর, মাটি, জল, খাদ্য এবং বাজার—এই পাঁচটি একে অপরের সঙ্গে জড়িত। তাই আলুচাষে কীটনাশক ব্যবহারের সমস্যা আসলে একটি সমন্বিত মানব-পরিবেশ সমস্যা, যার সমাধানও সমন্বিত পথেই খুঁজতে হবে।

জৈব কৃষি, জীব নিয়ন্ত্রণ ও টেকসই বিকল্পের সম্ভাবনা : সমস্যার এই তীব্রতা সত্ত্বেও আশার জায়গা আছে। হুগলি জেলার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সব কৃষক এখনও রাসায়নিকের অন্ধ সমর্থক নন; বরং ধীরে ধীরে একটি সচেতনতার সঞ্চার হচ্ছে। গবেষণায় উল্লেখ আছে, কৃষকেরা লক্ষ্য করছেন যে পুরনো কীটনাশক কম কাজ করছে, খরচ বাড়ছে, জমি ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। এই অভিজ্ঞতাই তাঁদের একাংশকে বিকল্প পদ্ধতির দিকে ভাবতে বাধ্য করছে।[১৪]

এখানে "জৈব কৃষি"কে শুধুমাত্র সম্পূর্ণ রাসায়নিকবর্জিত কৃষি হিসেবে দেখলে বিষয়টি সংকীর্ণ হবে। বরং জৈব কৃষি ও সমন্বিত রোগ-পোকা ব্যবস্থাপনাকে একটি ধারাবাহিক রূপান্তরের প্রক্রিয়া হিসেবে ভাবা উচিত। নিমতেল বা বায়োপেস্টিসাইডের ব্যবহার, রোগ-প্রতিরোধী জাত নির্বাচন, সুস্থ ও শোধিত বীজ আলুর ব্যবহার, জৈব কম্পোস্ট, ফসল পর্যায়ক্রম, আগাছা নিয়ন্ত্রণ এবং জমির স্বাস্থ্য রক্ষার পদ্ধতি—এসবই সেই রূপান্তরের অংশ।[১৫]

ফসল পর্যায়ক্রম এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একই জমিতে বারবার আলু করলে নির্দিষ্ট রোগ-পোকার চাপ বাড়ে এবং মাটির পুষ্টি-সমতা নষ্ট হয়। অথচ অন্য ফসলের সঙ্গে পর্যায়ক্রমিক চাষ করলে রোগচক্র ভাঙা যায়, রাসায়নিকের প্রয়োজন কমে, মাটির ভৌত ও জৈব গুণ কিছুটা পুনরুদ্ধার হয়। একইভাবে সোলানেসিয়াস গোত্রের ফসলকে পরপর না নেওয়ার পরামর্শও গবেষণায় দেওয়া হয়েছে।[১৬] অর্থাৎ জৈব চাষ শুধু সার বদলের বিষয় নয়; এটি জমির সঙ্গে এক নৈতিক ও বৈজ্ঞানিক সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রশ্ন।

পশ্চিমবঙ্গে আলু উৎপাদনে জৈব পুষ্টিসূত্রের প্রভাব নিয়ে করা গবেষণাও দেখায় যে জৈব উপাদান আলুর উৎপাদন-ব্যবস্থায় কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। গোবরসার, কম্পোস্ট, জৈব পুষ্টি ও মাটির গুণগত পুনরুদ্ধার কৃষিকে দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল করতে সাহায্য করে।[১৭] স্বীকার করতে হবে, রূপান্তরের এই পথে কিছু বাস্তব বাধাও আছে—প্রথম কয়েক বছরে উৎপাদন-ঝুঁকি, জৈব উপাদানের জোগান, প্রশিক্ষণের অভাব, বাজারে আলাদা মূল্য না পাওয়া, এবং কৃষকের তাৎক্ষণিক লাভের চিন্তা। কিন্তু এই বাধা অতিক্রম করা

অসম্ভব নয়। বরং কৃষক-সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী প্লট, সরকারি প্রণোদনা এবং জৈব পণ্যের জন্য আলাদা বিপণনব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারলে পরিবর্তন দ্রুত সম্ভব।

মূল বিষয় হল, জৈব বা সমন্বিত পদ্ধতি কৃষককে "বেশি স্প্রে মানেই বেশি নিরাপত্তা" এই মনস্তত্ত্ব থেকে বের হতে সাহায্য করে। সেখানে জমিকে কেবল উৎপাদনের যন্ত্র হিসেবে নয়, একটি জীবন্ত সম্পদ হিসেবে দেখা হয়। টেকসই কৃষির ভবিষ্যৎ এই মনোভাবের উপরই নির্ভর করছে।

সরকারি নীতি, বাজারব্যবস্থা ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার প্রয়োজন: আলুচাষের সংকটের একটি বড় অংশ বাজার ও নীতিনির্ভর। উৎপাদন ভালো হলেও কৃষক লাভবান হবেন, এমন নিশ্চয়তা নেই; আবার খারাপ দামের বছরে ক্ষতির বোঝা বহন করেন মূলত ছোট ও প্রান্তিক কৃষকেরাই। হুগলি জেলার গবেষণায় বারবার উঠে এসেছে যে মধ্যস্বত্বভোগী, কমিশন এজেন্ট, ফড়িয়া ও ঠান্ডা ঘর-মালিকদের প্রভাব আলুচাষের অর্থনীতিতে অত্যন্ত শক্তিশালী।[১৮] কৃষকেরা প্রায়ই উৎপাদনের শুরুতেই ঋণ, উপকরণ বা আগাম সহায়তার মাধ্যমে এই চক্রে ঢুকে পড়েন, ফলে ফসল ওঠার পরে স্বাধীন বিক্রির ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন।

এই পরিস্থিতিতে সরকারি নীতির প্রথম কাজ হওয়া উচিত ন্যায্য মূল্য ও বাজারস্থিতি নিশ্চিত করা। গবেষণায় সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে আলুর দামের অস্বাভাবিক ওঠানামা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের নির্দিষ্ট নীতি দরকার, যাতে কৃষক সরাসরি ক্রেতার কাছে বিক্রি করার সুযোগ পান এবং সারা বছর তুলনামূলক স্থিতিশীল মূল্য বজায় থাকে।[১৯] সমবায়ভিত্তিক বিপণন, কৃষক-উৎপাদক সংগঠন, কৃষিমণ্ডি ব্যবস্থার সক্রিয় ব্যবহার এবং ডিজিটাল বাজারতথ্য এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

দ্বিতীয়ত, কোল্ড স্টোরেজ ও সংরক্ষণনীতিতে সংস্কার প্রয়োজন। গবেষণায় বলা হয়েছে যে ছোট কৃষক অনেক সময় নগদের চাপে ফসল কাটার পরই বিক্রি করে দেন; তাই সরকার যদি কোল্ড স্টোরেজে রাখা আলুর বিপরীতে অগ্রিম অর্থপ্রদানের ব্যবস্থা, অথবা সেই মজুতের ভিত্তিতে ব্যাংকঋণের সুযোগ তৈরি করে, তবে কৃষক কম দামে তাৎক্ষণিক বিক্রির চাপ থেকে কিছুটা মুক্তি পাবেন।[২০] এটি বাজারে অতিরিক্ত সরবরাহের চাপও কমাবে।

তৃতীয়ত, কৃষিঋণ ও বীমার কার্যকর প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। ক্ষেত্রসমীক্ষায় পাওয়া গেছে যে ব্যাঙ্কঋণের জটিলতা ও বিলম্বের কারণে অনেক ছোট কৃষক মহাজনি ঋণের উপর নির্ভর করেন, যার সুদের হার অস্বাভাবিকভাবে বেশি।[২১] এ অবস্থায় স্বল্পসুদে সহজ কৃষিঋণ, সময়মতো ঋণমঞ্জুরি, এবং বাস্তবসম্মত কিস্তি-পরিশোধ ব্যবস্থা দরকার। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা ও বাংলা ফসল বীমা যোজনার মতো প্রকল্পের প্রকৃত সুফল যাতে আলুচাষির হাতে পৌঁছায়, সেই দিকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। গবেষণায় উল্লেখ আছে, এই নীতিগুলি কাগজে থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে পূর্ণ সুবিধা এখনও মাঠপর্যায়ে পৌঁছয়নি।[২২]

চতুর্থত, উৎপাদনের সঙ্গে মূল্যসংযোজনের সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আলুচিপস, স্টার্চ, ফ্লেক্স, গ্র্যানুল, ডিহাইড্রেটেড কিউব বা পাপড়ের মতো প্রক্রিয়াজাত শিল্প গড়ে উঠলে উদ্বৃত্ত আলুর বিকল্প বাজার তৈরি হবে। গবেষণায় স্থানীয় শিল্পোদ্যোগ ও ক্ষুদ্র-প্রক্রিয়াকরণকে উৎসাহ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।[২৩] একই সঙ্গে রপ্তানি ও আন্তঃরাজ্য বিপণনের জন্য নীতিগত সহায়তা, পরিবহণ-লজিস্টিক, এবং কৃষিপণ্যের গুণমান যাচাইব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে হবে।

সব মিলিয়ে, শুধুমাত্র ভর্তুকি বা মৌসুমি হস্তক্ষেপ যথেষ্ট নয়। আলুর জন্য একটি সমন্বিত কৃষিনীতি দরকার—যেখানে উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিপণন, ঋণ, বীমা, জৈব প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্যসুরক্ষা এবং কৃষক-সমবায়—সব কিছুকে একসঙ্গে ভাবা হবে।

বর্তমান সংকট ও ভবিষ্যতের রূপরেখা: হুগলি জেলার আলুচাষকে টেকসই পথে নিয়ে যেতে গেলে কয়েকটি বড় চ্যালেঞ্জ সামনে আসে। প্রথম চ্যালেঞ্জ হলো কৃষকের মানসিকতা ও বাস্তবতা—তিনি দীর্ঘমেয়াদি পরিবেশগত লাভের চেয়ে তাৎক্ষণিক ফলন ও নগদ আয়কে বেশি গুরুত্ব দেন, এবং তা অস্বাভাবিকও নয়। ঋণগ্রস্ত বা প্রান্তিক কৃষকের কাছে জৈব রূপান্তর একটি নৈতিক আহ্বান নয়, বরং অর্থনৈতিক ঝুঁকির প্রশ্ন। তাই পরিবর্তনের ভাষা হতে হবে কৃষকবান্ধব, ধৈর্যশীল ও বাস্তবসম্মত।

দ্বিতীয় সমস্যা জ্ঞান-অবকাঠামো। যতদিন কৃষকের প্রধান উপদেষ্টা থাকবেন দোকানদার বা প্রতিবেশী কৃষক, ততদিন কীটনাশকের সঠিক ব্যবহার, বিকল্প পদ্ধতির গ্রহণযোগ্যতা, কিংবা স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ—কোনওটাই সুসংহতভাবে গড়ে উঠবে না। প্রত্যেক ব্লকে কৃষি সহায়ক শিবির, ক্ষেত্রপ্রদর্শনী, মাটি পরীক্ষা, জল পরীক্ষা, কীটনাশক ব্যবহারের প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয় ভাষায় সহজ পরামর্শপুস্তিকা প্রয়োজন। স্কুল-কলেজ, কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র ও পঞ্চায়েত স্তরেও সচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে।

তৃতীয় সমস্যা বাজার। যতদিন কৃষক তাঁর ফসলের ন্যায্য দাম পাবেন না, ততদিন তিনি কম-ইনপুট, উচ্চ-মানের টেকসই কৃষির দিকে স্বাভাবিকভাবে এগোবেন না। বাজারে যদি কেবল চেহারায় সুন্দর, বড় এবং "দাগবিহীন" আলুরই চাহিদা থাকে, তাহলে কৃষকও রোগভীতির কারণে বেশি ওষুধ ব্যবহারের দিকে ঝুঁকবেন। তাই ভোক্তা-সচেতনতাও জরুরি—নিরাপদ খাদ্য, কম রাসায়নিক অবশেষ, স্থানীয় কৃষকের সুরক্ষা—এই ধারণাগুলিকে কৃষিনীতি ও খাদ্যসংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

চতুর্থ সমস্যা স্বাস্থ্যসুরক্ষা। যতদিন না গ্রামাঞ্চলে সুলভ সুরক্ষা সামগ্রী, ব্যবহৃত কীটনাশকের নিরাপদ সংরক্ষণ ও বর্জ্যব্যবস্থাপনা, এবং কৃষিশ্রমিকের নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা চালু হচ্ছে, ততদিন সমস্যাটি আংশিকই থেকে যাবে। কৃষকের স্বাস্থ্যকে কৃষি-উৎপাদনের বাহ্যিক বিষয় বলে ভাবলে চলবে না; সুস্থ কৃষকই টেকসই কৃষির ভিত্তি।

তবু ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ সমস্যাময় নয়। হুগলির আলুচাষিরা পরিশ্রমী, অভিযোজনক্ষম এবং অভিজ্ঞ। তাঁদের বাস্তব জ্ঞানের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পরামর্শ, জৈব বিকল্প, বাজারসংস্কার ও নীতিগত সমর্থন যুক্ত করা গেলে আলুচাষ একটি স্বাস্থ্যকর ও পরিবেশসম্মত পথে এগোতে পারে। রাসায়নিকের সম্পূর্ণ বর্জন হয়তো একদিনে সম্ভব নয়, কিন্তু নির্বিচার ব্যবহারের বদলে বিবেচনাশীল, পর্যায়ক্রমিক এবং সমন্বিত ব্যবস্থায় যাওয়া অবশ্যই সম্ভব।

উপসংহার: হুগলি জেলার আলুচাষ আমাদের সামনে এক জটিল কিন্তু অত্যন্ত শিক্ষণীয় বাস্তবতা তুলে ধরে। এই ফসল কৃষকের ঘরে নগদ আয় আনে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, বাজারকে সচল রাখে এবং আঞ্চলিক অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চার করে। একই সঙ্গে এই ফসলকেন্দ্রিক কৃষি-ব্যবস্থা অতিরিক্ত কীটনাশক ব্যবহার, ঋণনির্ভরতা, বাজারে দামের অস্থিরতা, জল-মাটি দূষণ এবং কৃষক-স্বাস্থ্যের ঝুঁকিকে তীব্র করে তোলে। ফলে আলুচাষকে শুধু "বেশি ফলন" বা "বেশি লাভ"-এর সূত্রে বিচার করলে চলবে না।

এই প্রবন্ধের আলোচনায় স্পষ্ট যে সমস্যার মূল তিনটি স্তর—প্রযুক্তিগত, অর্থনৈতিক এবং নীতিগত। তথ্যের অভাব এবং রাসায়নিকের সহজলভ্যতা প্রযুক্তিগত স্তর তৈরি করে; ঋণ, কম দামে বিক্রি, মধ্যস্বত্বভোগীর দৌরাত্ম্য এবং সংরক্ষণ-সঙ্কট অর্থনৈতিক স্তর তৈরি করে; আর অপর্যাপ্ত কৃষি-সম্প্রসারণ, দুর্বল বাজারনিয়ন্ত্রণ ও অসম্পূর্ণ বীমা-সহায়তা নীতিগত স্তরকে স্পষ্ট করে। এই স্তর ভেঙে না দিলে আলুচাষে টেকসই পরিবর্তন আসবে না।

অতএব, ভবিষ্যতের পথ একটাই—কৃষককেন্দ্রিক, স্বাস্থ্যসচেতন, পরিবেশসম্মত এবং ন্যায্য বাজারভিত্তিক আলু- উৎপাদন নীতি। জৈব কৃষি, সমন্বিত রোগ-পোকা ব্যবস্থাপনা, ফসল পর্যায়ক্রম, সরাসরি বিপণন, সমবায়, প্রক্রিয়াজাত শিল্প, কৃষিঋণ ও বীমার বাস্তব কার্যকারিতা—এসবকে একত্রে গ্রহণ করলেই হুগলির আলুচাষ নতুন সম্ভাবনার দিকে এগোবে। কৃষির সাফল্য তখন শুধু উৎপাদনের পরিমাপে নয়, মানুষের সুস্থতা, মাটির প্রাণশক্তি এবং গ্রামীণ জীবনের মর্যাদায়ও পরিমাপ করা যাবে। এই বোধই টেকসই কৃষির আসল ভিত্তি।

তথ্যসূত্র:

১। সাউ, মৌ। Emerging Trends of Potato Cultivation in Hooghly District, West Bengal, India। পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ, RKDF University, Ranchi, ২০২৩, পৃ. ১-৫, ১০৭-১১৪।

২। তদেব, পৃ. ৬-১৪।

৩। সাউ, মৌ এবং টপনো, শীতল। "Pesticides Use in Potato Cultivation: A Sample Survey Study from the Hooghly District, West Bengal, India," International Journal of Health Sciences। ৬(S2), ২০২২, পৃ. ৬৮-৭৫।

৪। সাউ, মৌ। Emerging Trends of Potato Cultivation in Hooghly District, West Bengal, India। পৃ. ১-৩।

৫। তদেব, পৃ. ৭৩-৮০, ১১৫-১১৮।

৬। সাউ, মৌ এবং টপনো শীতল। পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮-৭২।

৭। তদেব, পৃ. ৭১-৭৩।

৮। তদেব, পৃ. ৭২-৭৪।

৯। তদেব, পৃ. ৭৩-৭৫।

১০। তদেব, পৃ. ৭৪।

১১। মৌ সাউ', Emerging Trends of Potato Cultivation in Hooghly District, West Bengal, India, পৃ. ১১৩-১১৪।

১২। তদেব, পৃ. ১১৪-১১৫।

১৩। সাউ, মৌ। Emerging Trends of Potato Cultivation in Hooghly District, West Bengal, India, পৃ. ১৩-১৪, ১০৪-১০৫।

১৪। তদেব, পৃ. ১১৪।

১৫। তদেব, পৃ. ১১৪-১১৫।

১৬। তদেব, পৃ. ১১৫।

১৭। চেত্রী, এম., বসু, এ., কনার, এ., এবং মণ্ডল, বি। "Effect of Organic Sources of Nutrients on Potato Production in West Bengal," Potato Journal, ৩২(১), ২০০৫, পৃ. ১৬৩-১৬৪।

১৮। মৌ সাউ', Emerging Trends of Potato Cultivation in Hooghly District, West Bengal, India, পৃ. ৭৭-৮০।

১৯। তদেব, পৃ. ১১৫-১১৬।

২০। তদেব, পৃ. ১১৭-১১৮।

২১। মৌ সাউ', Emerging Trends of Potato Cultivation in Hooghly District, West Bengal, India, পৃ. ৭৪-৭৫।

২২। তদেব, পৃ. ১১৮।

২৩। তদেব, পৃ. ১১৭।

সহায়ক গ্রন্থ:

- সাউ', মৌ। Emerging Trends of Potato Cultivation in Hooghly District, West Bengal, India। পিএইচ.ডি. অভিসন্দর্ভ। RKDF University, Ranchi, ২০২৩।
- সাউ', মৌ এবং শীতল টপনো। "Pesticides Use in Potato Cultivation: A Sample Survey Study from the Hooghly District, West Bengal, India।" International Journal of Health Sciences, ৬(S2), ২০২২, পৃ. ৬৮-৭৫।
- চেত্রী, এম., বসু, এ., কনার, এ., এবং মণ্ডল, বি। "Effect of Organic Sources of Nutrients on Potato Production in West Bengal।" Potato Journal, ৩২(১), ২০০৫, পৃ. ১৬৩-১৬৪।
- চৌধুরি, এইচ. সি। Potato in West Bengal। কলকাতা: Director of Agriculture, Government of West Bengal, ১৯৫৭।
- পাণ্ডে, এস. কে. এবং সরকার, ডি। "Potato in India: Emerging Trends and Challenges in the New Millennium।" Potato Journal, ৩২(৩-৪), ২০০৫, পৃ. ৯৩-১০৪।
- কুমার, এন., পাণ্ডে, এন., দহিয়া, পি., রানা, আর., এবং পণ্ডিত, এ। "Post Harvest Losses of Potato in West Bengal: An Economic Analysis।" Potato Journal, ৩১(৩-৪), ২০০৪, পৃ. ২১৩-২১৬।